International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Issue-III, May 2023, Page No.01-08
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.i3.2023.01-08

অবৈদিক চার্বাক দর্শনের পুরুষার্থ প্রসঙ্গ পর্যালোচনা

বৃষভানু দাস
গবেষণা পণ্ডিত, দর্শন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ ভারত

Abstract:

Purushartha is one of the hot topics in Indian philosophical communities, whether theistic or atheistic. Judging from the point of view of the mainstream of Indian ethics, it can be seen that the most controversial part of the Charvaka philosophy is their purushartha.The concept. The Charvaka philosophy recognizes two ideals. Since the Charvaka philosophy is a materialist philosophy, it is right to accept the two purusharthas of Artha and Kama in their view. But if we judge in terms of mainstream Indian philosophy then artha and kama alone cannot be considered purushartha. Because apart from these two purusharthas of Artha and Kam a, two purusharthas called Dharma and Moksha are very important for human life. Now if the Charvakas accept two Purusharthas, then how will they explain life and how reasonable will that be? Humans are the best creatures in society, do they not have a higher purpose in life. Just to be happy, to eat and drink to your heart's content, to enjoy something - what should be the aim? Happiness is always accompanied by sorrow; it can never be the main goal. People don't want sorrow, they want to avoid sorrow. Therefore, there is considerable room for doubt as to how reasonable it is for people to ultimately accept such happiness in which suffering is essential. An attempt has been made in the present article to find answers too many such relevant questions regarding 'Pursartha'.

Key words: purusartha, theistic,atheistic,ethics, humans.

ভারতীয় দর্শনের আঙ্গিনায় নৈতিকতা সংক্রান্ত ব্যতিক্রমী ধারার চিন্তাভাবনার সন্ধান পাওয়া যায় চার্বাকদের আলোচনার মধ্যে। এক্ষেত্রে অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে চার্বাক দার্শনিকদের লেখা কোন এক বা একাধিক গ্রন্থের উপর নির্ভর করে চার্বাক মতকে সামগ্রিক ভাবে জানা এখনও পর্যন্ত সম্ভব নয়, কারণ তেমন কোন গ্রন্থের সন্ধানই এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায়নি। অথচ অন্যান্য ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ের প্রায় প্রতিটিই পূর্বপক্ষরূপে চার্বাকমতের উপস্থাপনা এবং খণ্ডন করেছেন। ফলে চার্বাকমতের আলোচনা করতে হলে অন্যান্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থের উপরই মূলত নির্ভর করতে হয়। কিন্তু এ ধরনের নির্ভরতার একটা অসুবিধের দিক রয়েছে। পূর্বপক্ষ হিসেবে চার্বাকদের উপস্থাপিত করার সময় যে সমস্ত বক্তব্য চার্বাকদের মত বলে উপস্থাপিত করা হয়েছে সেগুলি বস্তুতই চার্বাকদের মত কি না সে বিষয়ে সন্দেহ হলেও সন্দেহ

নিরসন করার সহজ কোন উপায় নেই। নৈতিকতা সম্পর্কে চার্বাকদের মত আলোচনা করার সময় বারবার এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। চার্বাক দর্শনের মূল প্রবক্তা বৃহস্পতির বক্তব্য রূপে এমন অনেক কথাই উপস্থাপন করা হয়েছে যে কথাগুলি বৃহস্পতির বলা অন্য অনেক কথার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণও নয়। অনেক সময় বৃহস্পতিকে এমন অনেক কথা বলতে শোনা যায় যে কথা বললে চার্বাকদের মতকে আর আক্ষরিক অর্থে 'লোকায়ত ' বলে স্বীকার করা যায় কি না, সে বিষয়েই সন্দেহ দেখা দেয়। বর্তমান নিবন্ধে চার্বাকদের 'পুরুষার্থ সংক্রান্ত' মতবাদ আলোচনা করার প্রসঙ্গে এই সব অসঙ্গতিপূর্ণ অংশগুলিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হবে এবং সঙ্গতিপূর্ণ চার্বাক নৈতিকতার ধারণাটি কেমন হতে পারে, তাও বোঝার চেষ্টা করা হবে।

চার্বাকদের মতে একমাত্র ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের দ্বারাই জ্ঞান হয়। প্রত্যক্ষের দ্বারা যা জানা যায় না, তা সত্য নয়। অনুমান প্রত্যক্ষ নির্ভর।অনুমান বা শব্দের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান নির্ভরযোগ্য বা সুনিশ্চিত নয়। জড়বস্তু প্রত্যক্ষযোগ্য, তাই তা স্বীকার করা যায়। জড় জগতের মূল উপাদান হল ক্ষিতি, অপ, তেজ ও বায়ু। চেতনাও প্রত্যক্ষের বিষয়। চেতনা হল উপবস্তু, ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ুর সংযোগে যখন জীবদেহ সৃষ্টি হয়, তখন চৈতন্যরূপ গুণের আবির্ভাব ঘটে। দেহ ছাড়া চৈতন্যের অস্তিত্ব নেই। চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহের বিনষ্টিতে চৈতন্যও বিলুপ্ত হয়।তাই আত্মার অমরত্বের কোন প্রশ্ন নেই। স্বর্গ - নরক, পরলোক, জন্মান্তর, কর্মফল এসব কথাও অর্থহীন। কারণ এইসব প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় না। চার্বাক সম্প্রদায় বলেন, এই পৃথিবীতেই স্বর্গ, নরক আছে। সদানন্দ যতি অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি গ্রন্থে স্বর্গ - নরক প্রসঙ্গে চার্বাকদের মত উল্লেখ করে বলেন যে, — লোকব্যবহারে বালক ও পণ্ডিত সদৃশ। মাংস ছাড়া ভোজন এবং সুন্দরী নারী ছাড়া শয়ন এবং পদব্রজে গমনই নরক এতে আর সন্দেহ কি আছে ? অর্থাৎ ভোজনের সময় মাংস পেলে, শয়নের সময় সুন্দরী নারী পাশে পেলে এবং গমনের সময় রথ পেলেই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।[১]

প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ হয় তাহলে ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, অদৃষ্ট — এইসব কিছুকেই অস্বীকার করতে হয়। অতীন্দ্রিয় ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। জগতের স্রষ্টা হিসেবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করার প্রয়োজন নেই। জড় জগতের সক্রিয়তার কারণ তার প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত আছে। বাইরের কোন নিয়ন্ত্রকের অস্তিত্ব অনুমান করা উচিত নয়।কারণ অনুমান নির্ভরযোগ্য নয়। ভারতীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত চারটি পুরুষার্থ - ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে শুধু অর্থ ও কামকেই চার্বাক দর্শনে স্বীকার করা হয়েছে,ধর্ম ও মোক্ষকে অর্থহীন বলা হয়েছে।

চার্বাকরা ধর্ম ও ঈশ্বর ছাড়া নৈতিকতাকেও অস্বীকার করেছেন। চার্বাকরা মনে করেন এইসবই অজ্ঞ ও অন্ধবিশ্বাসযুক্ত সাধারণ মানুষকে বঞ্চনা করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য পুরোহিতদের সৃষ্টি। আধুনিক যুগে কার্ল মার্কসও ধর্ম এবং ঈশ্বর সম্পর্কে এই ধরনের কথা বলেছেন।তবে মার্কস নৈতিকতার বিরোধী ছিলেন না।বস্তুবাদী হয়েও তিনি সমাজের বহু কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত স্বার্থকে বাদ দেওয়ার কথাই বলেছেন।

চার্বাক ব্যতিত অন্যান্য সকল দর্শন সম্প্রদায়ই চারটি পুরুষার্থ স্বীকার করেন। আবার চার্বাকষষ্ঠীতে বলা হয়েছে- 'অঙ্গনালিঙ্গনাদি জন্যং সুখমেব পুমর্থতা'- অর্থাৎ অঙ্গনার আলিঙ্গনজন্য সুখই পুরুষার্থ। উক্ত মতের সমর্থনে বলা হয়েছে স্ত্রীসঙ্গ ভোগ যে শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় এমন নয়, নিজ স্ত্রী, পরস্ত্রী ভেদ না করে যথেচ্ছ নারী বিহারকেও প্রশংসনীয় বলা হয়েছে—

"অর্থ দারগমনং প্রশংসতি
স্বদার - পরদারেষু যথেচ্ছং বিহরেৎ সদা।[২]

ব্যক্তির জীবনে কামের গুরুত্ব নির্দেশ করে বলা হয়েছে শরীর ধরনের জন্য আহার যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি কামও প্রয়োজনীয়।কিন্তু সুখমাত্রই যেহেতু দুঃখানুষক্ত তাই তা পুরুষার্থরূপে স্বীকার্য হতে পারে না। সুখের অনুভূতি সত্য নয়, সুখ ভোগের তৃষ্ণা কখনো শান্ত হয় না — উত্তরোত্তর উপভোগে এই আকাঙ্খা তথা কামনা দ্বিগুণ তেজে জ্বলে ওঠে। যদি কোনব্যক্তিকে পৃথিবীর যাবতীয় শস্য, পশু, রমণী সমস্ত একত্রে ভোগের নিমিত্ত প্রদান করা হয় তাহলেও তার ভোগের বাসনা উপশমিত হবে না। পাওয়ার হতাশাই তার অশান্তির মূল, যাবতীয় দুঃখের উৎস। একমাত্র ত্যাগের মাধ্যমেই তৃষ্ণার নিবৃত্তি সম্ভব। যথার্থ জ্ঞানের দ্বারা পরিদৃশ্যমান চাকচিক্যময় জগতের অনিত্যতা উপলব্ধিপূর্বক জন্ম,জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, কাম্যবস্তুর অপ্রাপ্তি প্রভৃতি যাবতীয় দুঃখের হাত থেকে মুক্তিলাভ কর সম্ভব এবং বিষ মিশ্রিত অন্ন যেমন আহারের অযোগ্য হওয়ায় বর্জনীয় তেমনি দুঃখমিশ্রিত সুখকেও সর্বৈবভাবে ত্যাগ করতে হবে।

কামজ সুখ যে দুঃখমিশ্রিত হতে পারে, সে কথা চার্বাকরাও স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা একথাও স্মরণ করিয়ে দেন যে দুঃখ মিশ্রিত হলেই যে মানুষ সেই সুখকে পরিত্যাগ করবে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এক্ষেত্রে মানুষের কর্তব্য হল সুখভোগের পথে যতটা সম্ভব দুঃখকে পরিহার করার চেষ্টা করা এবং যে ক্ষেত্রে যতটা সুখ আহরণ করা সম্ভব ততটাই আহরণ করা। অর্থাৎ চার্বাকরা মনে করেন দুঃখের আশঙ্কায় সুখকে পরিত্যাগ করা মনুষ্যোচিত কাজ নয়। তাই চার্বাকষষ্টিতে বলা হয়েছে,' বিষয় প্রাপ্তিজনা সুখ দুঃখের দ্বারা সংসৃষ্ট বলে তা পুরুষগণের ত্যাজ্য হবে'- এ ধরণের বিচার মূর্খতার পরিচায়ক। এই জগতে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে তুষযুক্ত ও কণাযুক্ত বলে উত্তম তণ্ডুল যুক্ত ধানকে পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করবে? চার্বাকরা আরও দৃষ্টান্তের সাহায্যে বোঝানোর চেষ্টা করেন যে বস্তুত পক্ষে দুঃখের সম্ভাবনায় আমরা সুখছনক কাজ থেকে বিরত থাকি না। হরিণ এসে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দেবে এই ভয়ে যেমন কৃষকেরা কৃষিকাজ থেকে বিরত থাকে না, ভিক্ষুক এসে চাইলে দিয়ে দিতে হবে এই ভয়ে যেমন গৃহস্থ রান্না করা থেকে বিরত হয় না, তেমনি অন্যত্রও দুঃখের ভয়ে সুখের অন্বেষণ থেকে বিরত থাকা অকর্তব্য। অর্থাৎ চার্বাকরা মনে করেন দুঃখের পরিহার করাই আমাদের চরম লক্ষ্য হতে পারে না। চার্বাকদের মতে পশুর সাথে মানুষের অন্যতম পার্থক্য এই যে, কোন কাজে দুঃখের সম্ভাবনা আছে বুঝতে পারলে পশুরা সে কাজ থেকে বিরত থাকে, কিন্তু মানুষ নিজের বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে পরিস্থিতির মধ্যে পরিবর্তন সাধন করতে পারে এবং দুঃখকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে গিয়ে সুখলাভের চেষ্টা করতে পারে। সুতরাং এ ধরণের চেষ্টা করাই মনুষ্যোচিত কর্তব্য।

চার্বাকরা সুখকে মুখ্য পুরুষার্থরূপে স্বীকার করেন বলেই যে চতুর্বর্গবাদী দার্শনিকরা তাদের সমালোচনা করেন কেবলমাত্র তা নয়। কোন সুখকে উৎকৃষ্টতর বলে গণ্য করা হবে সে বিষয়েও চার্বাকদের সাথে আস্তিকদের মতবিরোধ রয়েছে। সাধারণভাবে আস্তিকরা স্বীকার করেন যে বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান করলে স্বর্গসুখও লাভ করা সম্ভব। যদি সুখকেই পুরুষার্থ বলে গণ্য করতে হয় তাহলে স্বর্গসুখের উপযোগী ধর্মানুষ্ঠান করাই কর্তব্য হওয়া উচিত, কেননা স্বর্গসুখ অন্যান্য যে কোন সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর। আস্তিকদের এই মত চার্বাকরা সমর্থন করেন না। চার্বাকমতে স্বর্গসুখ অলীক কল্পনা মাত্র, ঐহিক সুখই একমাত্র বাস্তব। চার্বাকরা বলেন যে, স্বর্গের বাস্তব অস্তিত্ব সম্পর্কে কোন প্রমাণ নেই বলেই স্বর্গসুখও কাল্পনিক বিষয়। আস্তিকরা বেদ বাক্যকেই স্বর্গের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে স্বীকার করেন এবং দাবী করেন বেদবিহিত কর্ম যথাযথভাবে সাধন করা হলে স্বর্গলাভ করা সম্ভব। আস্তিকদের এই দাবীকে অসার প্রমাণ করার অভিপ্রায়ে চার্বাক যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করেন সেগুলি প্রধাণত দু প্রকারের। প্রথম প্রকারের যুক্তিতে চার্বাকরা

বলেন, বেদবিহিত এমন কিছু কর্ম আছে যা অভিপ্রেত দৃষ্ট ফল উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় প্রকারের যুক্তিতে বলা হয়, বেদবাক্যগুলির প্রামাণ্য সম্বন্ধে আস্তিকদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী মত রয়েছে বলে সেগুলির প্রামাণ্য স্বীকার করা যায় না। প্রথম যুক্তির আলোচনায় চার্বাক বলেন, বেদে বলা হয়েছে পুত্রকামী ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে পুত্র লাভ করবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় অনেকেই উক্ত যজ্ঞ করার পর অভিপ্রেত ফল লাভ করে না। কাজেই বেদবাক্যের মিথ্যাত্বের প্রসক্তি হয়। একটি বেদবাক্যও যদি এভাবে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয় তাহলে বেদকর্তাকে আপ্ত বলা যায় না, এবং ফলত অন্যান্য বেদবাক্যকেও প্রমাণ বলে স্বীকার করা যায় না।

চার্বাকদের এই যুক্তির উত্তরে বৈদিক দার্শনিকরা বলেন, যজ্ঞসম্পাদন করলেই পুত্রলাভ করা যাবে, এ ধারণা ঠিক নয়। যে সমস্ত শর্ত পূরণ করলে পুত্রেষ্টি - যজ্ঞ অভিপ্রেত ফল উৎপন্ন করতে পারে সেগুলি হল: (১) যজ্ঞসম্পর্কিত কর্তা, কর্ম ও সাধনের হানি হওয়া চলবে না, (২) জন্মদাতা মা ও বাবার শারীরিক বৈকল্য থাকা চলবে না। দার্শনিকরা দাবী করেন এই শর্তে গুলির কোন কোনটি পূরণ না হওয়ার ফলেই অনেক ক্ষেত্রে পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করা সত্ত্বেও যজমানের পক্ষে পুত্রলাভ করা সম্ভব হয় না। সুতরাং যাগজনিত দৃষ্টফল উৎপন্ন না হলেই সেই যাগের উপদেশক বেদবাক্যকে মিথ্যা বলা যায় না।

চার্বাকদের বক্তব্য সাধারণত পূর্বপক্ষরূপেই উপস্থাপিত হয়। সম্ভবত এই কারণেই অনেকক্ষেত্রে চার্বাকের মত খণ্ডনের জন্য যে যুক্তি দেওয়া হয় তার যথাযোগ্য উত্তর চার্বাকের পক্ষে দেওয়া সম্ভব হলেও উত্তরপক্ষীর লেখা গ্রন্থে সেই উত্তরের কোন উল্লেখ আমরা পাই না। যাগসফলতা ও বেদবাক্যের সত্যতার সঙ্গে দেওয়া আগের যুক্তিটিও বাস্তবিক পক্ষে চার্বাকদের গ্রহণযোগ্য না হওয়ারই কথা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, যে ভাবে চার্বাকদের বিরুদ্ধে যুক্তিটি সাজানো হয়েছে তাতে কখনই পুত্রেষ্টি যাগনির্দেশক বাক্যকে মিথ্যা বল যাবে না। যদি পুত্রেষ্টি যাগের পর যজমান পুত্র লাভ করেন তাহলে বলা হবে বাক্যটির সত্যতা প্রমাণিত হল। অথচ যদি যজমান অভিপ্রেত ফল লাভ না করেন তাহলে বলা হবে ফললাভের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত পূর্ণ হয় নি বলেই যাগ ব্যর্থ হয়েছে। ফলত এক্ষেত্রেও যাগ নির্দেশক বাক্যটি সত্য বলে গণ্য হবে। অন্যভাবে বলতে গেলে, যাগনির্দেশক বাক্যটি মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে কেবলমাত্র যদি একথা প্রমাণ করা যায় যে যাগের সফলতার সব শর্ত পূরণ করা সত্ত্বেও যাগ অভিপ্রেত ফল প্রদান করে নি। কিন্তু এভাবে বাক্যটির মিথ্যাত্ব প্রমাণের সম্ভাবনাও উত্তরপক্ষী স্বীকার করেন না। উত্তরপক্ষীর মতে যাগ সফল হল কি না তার উপর ভিত্তি করেই অনুমান করতে হবে শর্তগুলির যথাযোগ্য পূরণ হয়েছে কি না। অতএব বেদবাকাটির মিথ্যাত্ব প্রমাণের যাবতীয় সম্ভাবনাকেই অস্বীকার করা হচ্ছে। আলোচ্য যুক্তিটিকে বস্তুতপক্ষে কখনই একটি সৎযুক্তি বলে স্বীকার করা সম্ভব নয় এই কারণে যে এই যুক্তিটি স্বীকার করলে একথাও স্বীকার করতে হবে যে, যে কোন যজ্ঞ যে কোন ফল উৎপন্ন করতে পারে। যেমন, সেক্ষেত্রে দাবি করা যাবে যে 'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করলে রাজ্য লাভ করা যায়' এই বাক্যটিও সত্য। কোন ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করে রাজ্য লাভ না করলেও ঐ বাক্যটির মিথ্যাত্ব প্রমাণিত হবে না, কারণ সেক্ষেত্রেও বলা যাবে যে যাগানুষ্ঠানের সব শর্ত পূরণ হয় নি বলেই অভিপ্রেত ফললাভ হয় নি। এভাবে যে কোন ফলের প্রতি যে কোন যাগের কার্যকারিতা সিদ্ধ হলে বিশেষ ফললাভের জন্য বিশেষ যজ্ঞ করার বৈদিক বিধির কোন প্রাসঙ্গিকতাই থাকবে না। সুতরাং যে যুক্তি গ্রহণ করলে বেদবাক্য তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় সেই যুক্তি প্রয়োগ করে বৈদিক দার্শনিক কী ভাবে চার্বাকমত খণ্ডন করার চেষ্টা করবেন?

স্বর্গসুখের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে চার্বাক যে দ্বিতীয় প্রকারের যুক্তির অবতারণ করেন তাতে বলা হয়, স্বয়ং বৈদিক দার্শনিকরাই বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে পরস্পর বিরোধী মত পোষণ করেন, সুতরাং বেদবাক্যকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করা অযৌক্তিক। সর্বদর্শনসংগ্রহে মাধবাচার্য চার্বাকদের এই যুক্তিটি উপস্থাপিত করে বলেন, ' কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্যবাদী মীমাংসকগণও জ্ঞানকাণ্ডের প্রামাণ্যবাদী বেদান্তিগণ পরস্পর বেদের জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন, অর্থাৎ মীমাংসক জ্ঞানকাণ্ডের এবং বেদান্তী কর্মকাণ্ডের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন। পরস্পর পরস্পরের প্রামাণ্য খণ্ডন করায় সমস্ত বেদেরই প্রামাণ্য খণ্ডিত হয়েছে।বলা বাহুল্য আস্তিকরা এই মত গ্রহণ করেন না।

চার্বাকরা যে শুধুমাত্র স্বর্গসুখের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন তাই নয় ; তাঁরা পরলোক ও জন্মান্তরের সম্ভাবনাও অস্বীকার করেন। দেহাত্মবাদী চার্বাকের মতে ইহলোকে দেহের নাশ হওয়ার পরে আত্মার কোন অস্তিত্বই থাকে না বলে সেই আত্মার বাসস্থানরূপে পরলোককে স্বীকার করার কোন প্রয়োজনই হয় না। বৃহস্পতিসূত্রে তাই বলা হয়, 'নাস্তি পরলোকঃ। পরলোকিনাহভাবাৎ পরলোকাভাবঃ '। আবার, দেহই যদি আত্মা হয় তাহলে মৃত্যুর পর দেহ নষ্ট হয়ে গেলে কারও পক্ষেই পুনরায় জন্মগ্রহণ করা সম্ভব নয়। নৈতিকতা সংক্রান্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে পরলোক ও জন্মান্তরের অস্বীকৃতি সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আস্তিক সম্প্রদায়ের নৈতিকতা সংক্রান্ত তত্ত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হল কর্মফলবাদ এবং পরলোক ও জন্মান্তরের সম্ভাবনাকে স্বীকার না করলে প্রচলিত কর্মফলবাদকে স্বীকার করা যায় না।

আবার কোনো কোনো উৎসে চার্বাকের মত বলতে এক কথা বলা হয়, অন্য উৎসে তার থেকে একটু আলাদা। যেমন, কারও মতে, চার্বাকরা বলেন, কামই পুরুষার্থ অর্থাৎ সুখই জীবনের লক্ষ্য।[৩] অন্য মতে, চার্বাকরা কাম ও অর্থ- দুটিকেই পুরুষার্থ বলে মনে করেন।এ ক্ষেত্রে পুরোপুরি সংশয়মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। চার্বাকরা আদৌ পুরুষার্থ - র নিরিখে ভাবতেন কিনা— এই প্রশ্নও তোলা যায়।

দুটি উৎস যেখানে পরস্পর-বিরোধী— সেখানে কী কর্তব্য? কেউ কেউ বলেছেন, চার্বাকরা শুধু প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ (যথার্থ জ্ঞানের উপায়)বলে স্বীকার করেন, অনুমানও কিছু নয়। আবার কেউ কেউ বলছেন, লৌকিক ক্ষেত্রে এঁরা অনুমানকে মানেন (যেমন, ধোঁয়া দেখে আগুন), কারণ তার পেছনে প্রত্যক্ষ আছে। কিন্তু অলৌকিক ব্যাপারে (ঈশ্বর, পরলোক ইত্যাদি) অনুমানকে তাঁরা প্রমাণ বলে মানতে রাজি নন।

এক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনা ও কালক্রম— দুটিকেই কাজে লাগানো যায়। যাঁরা প্রথম মতটিকেই চার্বাকদের একমাত্র মত বলেন (জয়ন্তভট্ট, বাচস্পতিমিশ্র, হেমচন্দ্র তা- ই বলেছেন), তাঁরা বিষয়টিকে বিকৃতভাবে হাজির করেন, বা অজ্ঞতার পরিচয় দেন। এঁদের মধ্যে জয়ন্তভট আবার একই গ্রন্থে লিখেছেন,চার্বাকদের মতে প্রমাণের সংখ্যা ঠিক করা যায় না। এর থেকে, খুব বেশি হলে চার্বাকদের একাধিক সম্প্রদায়ের সম্ভাবনা জোরদার হয়, সব চার্বাক - ই এ বিষয়ে একমত ছিলেন তা প্রমাণ হয় না।

আর যেখানে কোনো কোনো উৎসে একটি মত পাওয়া যাচ্ছে (যেমন, চার্বাকরা অবাধ ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করতে বলেন) অন্যান্য উৎস একেবারেই নীরব? এখানেও যুক্তিসঙ্গত সম্ভাবনাকেই গুরুত্ব দিতে হবে। যে কটি প্রশ্ন সব উৎসেই উঠেছে, একমাত্র সেগুলিই বিবেচনার যোগ্য। ইন্দ্রিয়সুখ নিয়ে চার্বাকদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন জৈন ও ব্রাহ্মণ্য লেখকরা, তা - ও মূলত কাব্যে - নাটকে, দর্শনের গ্রন্থে নয়। বৌদ্ধরা এ বিষয়ে কিছুই বলেন নি। এ ক্ষেত্রে অভিযোগটি খারিজ করে দেওয়া যায়।

চার্বাকদর্শনের উৎস সম্পর্কে যেটুকু তথ্য পাওয়া যায় তা যথেষ্ট নয়, ঠিকই; তাহলেও ঐ দর্শনের মূল ধাঁচটি তাতেও ধরা পড়ে। এখন দরকার হলো, সব উৎসকে কাল অনুযায়ী সাজানো, সেগুলিকে যুক্তিসঙ্গতভাবে বিচার করে বাছাই করা, আর সবশেষে তার থেকে ঐ দর্শনের সারকথাগুলি সঙ্কলন করা। এই ঝাড়াই - বাছাই - এর কাজটি এখনও ঠিকমতো করা হয় নি। যিনি যেখানে চার্বাক/লোকায়ত/বৃহস্পতি - সূত্র বা শ্লোক বলে যা কিছু বলেছেন, তার সব - ই এতকাল নির্বিচারে মেনে নেওয়া হয়েছে। একই শ্লোকের যদি একাধিক পাঠ পাওয়া যায়, তবে একটিকে অন্যটির পাঠভেদ বলে মনে করা হয়। দুটিই যেন সমান গ্রাহ্য। ঘটনা কি তা - ই? মজার ব্যাপার হলো, চার্বাকমতের সূত্র ও শ্লোক খুব বেশি পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু একই সূত্র ও শ্লোক, নানা পাঠভেদসমেত, বহু জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন, এই বিখ্যাত শ্লোকটি
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদ্ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ।।[৪]

যতদিন বাঁচবে, সুখে বাঁচাবে, ধার করেও ঘি খাবে। ছাই হয়ে যাওয়া দেহ আবার কোথায় (বা কোথা থেকে) ফিরে আসবে? অনেকেই ভাবেন চার্বাকদর্শনের সারাৎসার যেন এই শ্লোকেই ধরা আছে। কোথায় শ্লোকটি পাওয়া গেল, কে এটি প্রথম বলেছিলেন— সাধারণ লোকে কেন,দর্শনের অনেক পণ্ডিতও তা জানেন না।

বেদের প্রামাণ্যে অবিশ্বাসী বলেই চার্বাক নাস্তিক শিরোমণি। এবং বেদে ধর্মকে পুরুষার্থ বলা হলেও, চার্বাকদের কাছে তা অপ্রয়োজনীয়। তাঁদের কাছে ধর্মাচরণ ভণ্ড পুরোহিত শ্রেণীর জীবিকা নির্বাহের উপায় মাত্র। পাপ পুণ্যের ধারণা তাঁদের কাছে স্বীকৃত নয়। যেহেতু এগুলি অপ্রত্যক্ষীভূত। আর যেহেতু পাপ - পুণ্যের কোন অস্তিত্বই নেই, তাই ধর্মাচরণেরও কোন আবশ্যিকতা নেই। স্বর্গও নেই, নরকও নেই। তাই অপবর্গ বা মুক্তিও নেই। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ — এই কথার উপর ভিত্তি করে, চার্বাকেরা যা কিছু অপ্রত্যক্ষ তারই অস্তিত্ব অস্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে, প্রত্যক্ষযোগ্য চতুর্ভুজ থেকে উৎপন্ন দেহই একমাত্র সত্য, দেহাতিরিক্ত আত্মা, ঈশ্বর, স্বর্গ, নরক, অদৃষ্ট, মোক্ষ বা মুক্তি তাঁর দর্শনে স্বীকৃত হয়নি। তাঁরা বেদ ও সমস্ত ধর্মশাস্ত্র ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের বিরোধিতা করেছেন। তাই তাঁদের মতে, দৈহিক সুখ, ইন্দ্রিয় সুখলাভের মাধ্যমে পার্থিব জীবনকে সুখময় স্বচ্ছন্দগতি করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য।[৫]

চার্বাকবাদীরা জগৎকে বস্তুবাদী দৃষ্টিতে দেখেছেন। দেখেছেন দৈহিক সত্তারূপে। কিন্তু মানুষ কেবল দেহ নয়, জীব নয়, মানুষ বুদ্ধিমান, মননশীল জীব। তাই সে আহার, নিদ্রাতে তৃপ্তি পায় না। সে অনুসন্ধান করে চলে এক পরম শান্তির, পরম কাম্য বস্তুর। সেই একান্ত কাম্য বস্তু হল মানুষের পরম পুরুষার্থ, — মুক্তি তথা মোক্ষ লাভ। যা লাভ করলে, মানুষের আর কিছু কামনা থাকে না। মন ভরে ওঠে এক পরিপূর্ণ শান্ততায়।

স্বর্গ নাই, অপবর্গ বা মুক্তিও নাই, মৃত্যুর পর পরলোকে গমনকারী কোন আত্মাও নাই। বর্ণাশ্রমাদি বিহিত ক্রিয়ারও কোন ফল নাই। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে নিহত পশুর যদি স্বর্গলাভ হয়, তবে যজ্ঞকারী যজমান কেন তার পিতাকে হত্যা করে না ? শ্রাদ্ধ যদি মৃত ব্যক্তিগণের তৃপ্তির কারণ হয়, তবে নির্ব্বাণ প্রদীপে তৈলপ্রদানে তার শিখা প্রদীপ্ত হওয়া উচিত। যারা পৃথিবী হতে চলে যাচ্ছে, তাদের পাথেয়ের কল্পনা বৃথা, কারণ, তাহলে গৃহে বসে শ্রাদ্ধ করলেই পথস্থিত ব্যক্তির তৃপ্তিলাভ ঘটত। স্বর্গস্থিত পিতৃগণ যদি তাদের উদ্দেশ্যে দান হতে তৃপ্তিলাভ করতেন, তবে যে ব্যক্তি প্রাসাদের উপরে বসে আছে, তাদের উদ্দেশ্যে দান করলেও এটা দ্বারা তার তৃপ্তি হত। যতদিন বাঁচবে,সুখে বাঁচিবে,ঋণ করেও ঘি খাবে।যে দেহ ভস্ম হয়ে যায়, তা আর

ফিরে আসে না। যদি জীব এই দেহ হতে নির্গত হয়ে পরলোক নামক স্থানে যায়, তবে বন্ধুজনের স্নেহে আকুল হয়ে কেন আবার ফিরে আসে না? মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রেতকার্য্য, —ব্রাহ্মণদের জীবিকার জন্য বিহিত হয়েছে, এটা ছাড়া এইগুলির অন্য কোন প্রয়োজন নেই। অতএব প্রাণিগণের কল্যাণের জন্যই চার্ব্বাক মত অবলম্বন করা কর্তব্য।

আবার এক শ্রেণীর চার্বাকগণ পরবর্তীকালে অগ্রসর হয়ে বলেন যে - জীবমাত্র যে সাধারণ সুখ বা জৈবসুখের কামনা করে তা আমাদের পুরুষার্থ নয়। আমরা জীব হলেও মানুষ। আমাদের পুরুষার্থ হল মনুষোচিত সুখ। দুঃখকে বর্জন করে যে সুখ সেই সুখ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ করে যে সুখ সেই সুখ। সেই সুখের নাম ভূমা। এই সুখ মনুষ্যত্বের গৌরব। উপনিষদের ঋষির সাথে তাঁরা সুর মিলিয়ে বলেন: 'ভূমৈব সুখম্।' এই ভূমাই আনন্দ এবং আনন্দই মানুষের পুরুষার্থ। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন— " মানুষ যদি ক্ষুদ্র হইত এবং ক্ষুদ্রতাতেই মানুষের যদি শেষ হইত, তবে দুঃখের মতো অসংগত কিছুই হইতে পারিত না।... বিশ্বসংসারের মধ্যে মনুষ্যত্বই ... দুঃখের মহিমায় মহীয়ান, ... এই দুঃখই মানুষকে বৃহৎ করে, ... এবং এই বৃহত্ত্বই মানুষকে আনন্দের অধিকারী করে তোলে'।

জীবমাত্রের কাম্য জৈবসুখের আকাঙ্খার নিবৃত্তি আছে। আহার, বিহার প্রভৃতি জৈব প্রয়োজনের অভাব পূর্ণ হলেই এরূপ আকাঙ্খার নিবৃত্তি হয় এবং তারা সুখী হয়। আবার, এই আকাঙ্খা বাধাপ্রাপ্ত হলেই দুঃখ উৎপন্ন হয়। কিন্তু এই সুখে মনুষ্যত্ব নেই। অপরপক্ষে, প্রাণীজগতের মধ্যে কেবলমাত্র মানুষেরই জৈব প্রয়োজনের আকাঙ্খা ব্যতীতও আর এক প্রকার আকাঙ্খা রয়েছে। তা হল জ্ঞানের আকাঙ্খা, কর্মের আকাঙ্খা, প্রেমের আকাঙ্খা। এই আকাঙ্খার অন্ত নেই, নিবৃত্তি নেই। এটি ' উপভোগেন ন সাম্যতি। ' সে সীমায়িত জৈবসুখকে অগ্রাহ্য করে, দুঃখকে আত্মসাৎ করে, অসীম অনন্তের সন্ধানে কেবলই অগ্রসর হতে চায়। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী বলেন— "এই আকাঙ্খার গতি আছে, কিন্তু গন্তব্য স্থান নেই। এই আকাঙ্খাই মনুষ্যত্ব, ইহাই ভূমার সাধনা।"[৬] এটিই আনন্দের তপস্যা। তাই জৈবসুখের বিপরীত দুঃখ।কিন্তু আনন্দের বিপরীত দুঃখ নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 'কাম এবৈক: পুরুষাথ:' - এই বার্হস্পত্য সূত্রে উল্লিখিত 'কাম' শব্দটির অর্থ এই চার্বাকগণের ব্যাখ্যায় বহুলভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। 'কাম' বলতে তাঁরা মনুষ্যোচিত কামনা অর্থাৎ বৃহত্তর সুখ, আনন্দ বা ভূমাকেই বুঝিয়েছেন। দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর মতে, এই শ্রেণীর চার্বাকগণ কার্যত ঔপনিষদিকগণের অধ্যাত্মবাদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন। এরাই সুশিক্ষিত চার্বাক। এঁরা যেন মর্ত্যজীবনকে অনন্তজীবনের মধ্যে বিধৃত করেছেন। এঁদের মতের মধ্যে যেন ধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের সেই বাণী: "আজ বাজুক ভূমানন্দের সেই মেঘমন্দ্র সুন্দর ভাষণ সংগীত যাতে আমরা নিজেকে নিজে অতিক্রম করে অমৃতলোকে জাগ্রত হই।... মর্ত্যজীবনকে অনন্তজীবনের মধ্যে বিধৃতরূপে ধ্যান করি।"

চার্বাকগণ জীবনপ্রেমিক। জীবনের বাস্তব বিশ্লেষণ থেকেই তাঁরা সুখকে পরম কাম্যবস্তু বা পরমার্থ হিসেবে অভিহিত করেছেন। কিন্তু কালের প্রবাহে চার্বাক মতে সুখের স্বরূপটি ক্রমবিবর্তিত হয়েছে। ফলতঃ বদলেছে চার্বাকগণের পুরুষার্থের স্বরূপ সম্পর্কীয় ধারণাও। জীবনের স্থূল প্রয়োজন হিসেবে দৈহিক সুখকে আগ্রাহ্য করা যায় না, একথা সত্য। এক শ্রেণীর চার্বাকগণের মতের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের এই চিন্তাভাবনাই তাই প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু কেবলমাত্র আত্মকেন্দ্রিক ইন্দ্রিয়সুখই পুরুষার্থ হলে সমাজজীবন

অচল হয়ে পড়ে। তাই দ্বিতীয় শ্রেণীর চার্বাকগণ উচ্চতর মানসিক সুখ, পরসুখকে পুরুষার্থরূপে স্বীকার করে নিজস্ব মতবাদের মানবিক মুখকেই তুলে ধরেছেন। মূল্যবর্জিত পশুজীবনের উর্দ্ধে মানুষকে মানুষের মর্যাদার স্বরূপটি আবিষ্কার করতে প্রণোদিত করেছেন। এই শ্রেণীর চার্বাকগণের মতে বৃহস্পতি হয়তো এমন সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন যে সমাজে সকলের পক্ষে সুখী হওয়া সম্ভব, যে সুখভোগ এই পৃথিবীতে স্বর্গের সন্ধান দেবে। অপরপক্ষে, যে সব মানবিক মূল্য জীবনকে মানুষের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে কালের বিচিত্র গতিতে অন্য শ্রেণীর চার্বাকগণ তারই অভিমুখে আর এক ধাপ অগ্রসর হয়েছেন। আত্মসুখ, দুঃখ যেখানে মানুষের আর প্রতিবন্ধক নয়, অনন্ত জ্ঞান, কর্ম এবং অনন্ত প্রেমের তৃষায় দুঃখকে বরণ করে, আত্মসাৎ করে, এক অসীম অনন্তের সন্ধানে এই চার্বাকগণের যাত্রা। তাঁদের মতে সংসারে থেকেই অসীম, অনন্ত, আনন্দময় সুখ ভূমাকে উপলব্ধি করতে হবে।সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে,কালের প্রবাহে চার্বাকগণের পুরুষার্থ সম্পর্কীয় ধারণাটি নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে এবং ভারতীয় দর্শনকে করে তুলেছে জীবনমুখী।[৭]

সূত্রনির্দেশ:

১. বসু,অরবিন্দ ও চক্রবর্তী,নিবেদিতা, ধর্মদর্শন পরিচয়,প্রগেশিভ পাবলিশার্স, সন- ২০১৪,পৃঃ:১৭৯।
২. গুপ্ত,পাপিয়া; পুরুষার্থরূপে কাম : একটি সংক্ষিপ্ত কথন,প্রসঙ্গ পুরুষার্থ,সম্পাদিকা সর্বানী ব্যানার্জী; পৃ:।
৩. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ;চার্বাকচর্চা; ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড; সন-২০১৭; পৃ: ৪৬।
৪. তদেব,পৃঃ:৩৮।
৫. দাস,চন্দনা; ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে মুক্তির স্বরূপ; প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, সন-২০০৬;পৃ:।
৬. শাস্ত্রী,দক্ষিণারঞ্জন;চার্বাক দর্শন,সন - ১৩৬৬, পৃঃ -১৫১।
৭. ব্যানার্জী,অনন্যা;চার্বাক সম্মত পুরুষার্থ বিষয়ক ধারণার ক্রমবিবর্তন,প্রসঙ্গ পুরুষার্থ,সম্পাদনা ডঃ সর্বার্নি ব্যানার্জী।